দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
Disaster Management

৮

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ (Disaster Prone) দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমি ব্যবহারেরর বৈচিত্র্যতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়াও অসংখ্য নদনদী, উপকূলভাগের গঠন প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ, বন্যা ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১: বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ
পাঠ- ৮.২: বন্যা ও বন্যা ব্যবস্থাপনা
পাঠ- ৮.৩: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা
পাঠ: ৮.৪: বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাসমূহ

পাঠ-৮.১ বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ
Disaster Risk Environment of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানব সৃষ্ট দুযোর্গের ঝুঁকির পরিবেশ বলতে পারবেন;
- জৈবিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারণে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ অবক্ষয়ের দরুন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের শিকার হচ্ছে বিশ্ববাসী। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দুর্যোগের ধরন ও দুর্যোগ সৃষ্টির কারণের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যথা- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির পরিবেশ, মানব সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকির পরিবেশ এবং জৈবিক দুর্যোগের ঝুঁকির পরিবেশ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির পরিবেশ
Natural Disaster Risk Environment

বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিধস, ভূমিকম্প ও বজ্রপাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিসমূহ বর্ণনা করা হলো।

১। **বন্যা (Flood):** বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র নামক তিনটি প্রধান নদী ও এর শাখা প্রশাখা দ্বারা বাহিত পলি দিয়ে এই ব-দ্বীপ গঠিত। এ কারণে প্রতিবছর বন্যা বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক দুর্যোগ। এছাড়া দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাস ঘটিত বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। DDM. ২০১৬ অনুযায়ী ১.৮ থেকে ৩.৬ মিটার উচ্চতার ভূমি বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে।

২। **ঘূর্ণিঝড় (Cyclone):** ভারত মহাসাগরের হটস্পট নিকোবার ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটে সৃষ্ট নিম্নচাপ অধিকাংশ সময়ে বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় এবং এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশে আঘাত হানে।

৩। **খরা (Drought):** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণত দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে কম। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কমে গেছে এবং ঐসব এলাকার খরার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

৪। **ভূমিধ্বস (Landslide):** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিধ্বস হয়। এছাড়াও উক্ত অঞ্চল ভূমিকম্প ও বৃষ্টিপাত প্রভাবিত ভূমিধ্বসের ঝুঁকিতে রয়েছে। তন্মধ্যে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং কক্সবাজার বৃষ্টিপাত ঘটিত ভূমিধ্বসের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আছে।

৫। **ভূমিকম্প (Earthquake):** বিগত শতাব্দীর ভূমিকম্পের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৮.০ মাত্রার (রিখটার স্কেল) ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৯৯৭ সালে মে মাসে সিলেটে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প, একই বছর ২১শে নভেম্বর বান্দরবানে ৬.০ মাত্রার ভূমিকম্প, ১৯৯৯ সালের মহেশখালীর ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প, ২০০৩ সালে রাঙামাটি এলাকায় ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

৬। **বজ্রপাত (Thunderstorm):** সম্প্রতি ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালে বজ্রপাতে সর্বোচ্চ মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৩৫৯ জন (এমডিএমআর, ২০২০)

মানব সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি

Human made Disaster Risk

বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের কারণে চামড়া শিল্প, জাহাজভাঙ্গা শিল্প, রাসায়নিক শিল্পে প্রায় দুর্ঘটনা হয়। ২০১৯ সালে ঢাকায় চকবাজার এলাকায় রাসায়নিক বিস্ফোরণে ৭০ জনের মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালে সারাদেশে ভবনধ্বসে ২৬ জন মানুষ মারা যায়। (সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী)

জৈবিক দুর্যোগ ঝুঁকি

Biological Disaster

সম্প্রতির কোভিড-১৯ সহ বিগত বছরগুলোতে যেমন ২০১৭ সালের চিকুনগুনিয়া, ২০০৭ সালে ব্রার্ড ফ্লু, ২০০৪ সালের নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ জৈবিক হ্যাজার্ডের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু নিপাহ, জিকা ভাইরাসের আক্রমণ জৈবিক হ্যাজার্ডের অন্তর্গত।

সারসংক্ষেপ:

প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারণে প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। দুর্যোগের ধরন ও দুর্যোগ সৃষ্টির কারণের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে দুর্যোগঝুঁকির পরিবেশকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ এবং জৈবিক দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ । বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহ হলো- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় , ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প এবং বজ্রপাত । এছাড়াও বাংলাদেশে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশের মধ্যে বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের কারণে প্রায় চামড়া শিল্প, জাহাজভাঙ্গা শিল্প, রাসায়নিক শিল্পের দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মহামারি কোভিড-১৯ সহ বিগত বছরগুলোতে যেমন ২০১৭ সালের চিকুনগুনিয়া, ২০০৭ সালে ব্রার্ড ফ্লু, ২০০৪ সালের নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ জৈবিক হ্যাজার্ডের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু, নিপাহ ভাইরাস, জিকা ভাইরাস প্রভৃতিও জৈবিক হ্যাজার্ড এর অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ-৮.২ বন্যা ও বন্যা ব্যবস্থাপনা
Flood and Flood Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন্যার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বন্যার কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বন্যার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বন্যা ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

ভূ- প্রকৃতিগতভাবে, বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ি ভূমি ব্যতীত বাংলাদেশ সমতল ভূমি যা মূলত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহ দ্বারা বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। এছাড়ও উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু সম্পন্ন বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২২০০-২৫০০ মিলিমিটার। মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণসমূহের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যায় প্লাবিত হয়। কখনো কখনো এই বন্যা মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় । নদীর তীর উপচে পানি যখন সমতল ভূমিকে প্লাবিত করে এবং সমতল ভূমির সাথে সংলগ্ন উচ্চ ভূমিকেও প্লাবিত করে, অথবা যখন নদীর পানির উচ্চতা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিকে বন্যা বলা হয়। (Hossain, 2004) । আলোচ্য ইউনিটে বন্যার কারণ, বন্যার প্রকারভেদ এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বন্যার কারণ
Causes of Flood

বাংলাদেশের ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। বন্যায় প্রতি বছর বাংলাদেশে শতকরা ২০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। তীব্র বন্যায় ৬৮ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর বন্যা বাংলাদেশের ব্যপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে। যেমন-১৯৮৮,১৯৯৮,২০০০ ও ২০০৭ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের বন্যার প্রধান কারণসমূহ হলো-

- বাংলাদেশে মোট নদনদীর সংখ্যা ২৩০ টি। তন্মধ্যে প্রধান তিনটি নদীর (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা) শাখা প্রশাখাসহ মোট প্রবাহ ১.৭মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। এই বিশাল নদী অববাহিকার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাকি ৯৩ শতাংশ নেপাল, ভূটান, চীন ও ভারতের ভূ-খণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মোট আয়তনের ১২ গুণ অধিক আয়তনের সমপরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় যা বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ।
- দেশের অভ্যন্তরীণ নদীসমূহে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তা প্রায় ৯ মিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে। বাংলাদেশে নদীগুলো বছরে ১.২ থেকে ২.৪ বিলিয়ন টন পলি বঙ্গোপসাগরে বয়ে নিয়ে যায় তন্মধ্যে ৩৮ শতাংশ পলি আসে গঙ্গার পানির সাথে এবং ৬২ শতাংশ আসে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের সাথে। উজান থেকে প্রচুর পরিমাণে পলি আসার কারণে নদী ভরাট হয় ও বন্যা হয়।
- বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বঙ্গোপসাগরের জোয়ারে প্লাবিত হয়। এছাড়াও পাহাড়ি নদীর পানি উপচে আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টির জন্য বন্যা এবং অধিক জলাবদ্ধতার কারণে নগর বন্যাও দেখা যায়।

বন্যার প্রকারভেদ

Classification of Flood

বন্যা সংঘটিত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বন্যা প্রধানত চার প্রকার। যথা-

১. আকস্মিক বন্যা
২. নদীসৃষ্ট বন্যা
৩. বৃষ্টিজনিত বন্যা
৪. উপকূলীয় বন্যা

১। **আকস্মিক বন্যা (Flash Flood):** এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী ভারি বর্ষণের দরুন পাহাড়ি নদীর পানি উপচে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এলাকায় আকস্মিক ভাবে যে বন্যা দেখা যায় তাকে আকস্মিক বন্যা বলে। এদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি প্রভৃতি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ জেলা। ২০০২, ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, এবং ২০১০ সালে আকস্মিক বন্যা উত্তর পূর্ব হাওড় অঞ্চলের শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

২। **নদীসৃষ্ট বন্যা (Reverine Flood):** বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পানি প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাবে বন্যা হয়। জুন ও জুলাই মাসে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ব্রহ্মপুত্র নদীখাতে সর্বোচ্চ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। অপর দিকে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রধান নদী দুটির পানির প্রবাহ যখন সর্বোচ্চ তখন একই সময়ে ভয়াবহ বন্যার রূপ নেয়।

৩। **বৃষ্টিজনিত বন্যা (Rainfall Flood):** বৃষ্টিজনিত বন্যা দেশের দক্ষিণ, পশ্চিম অঞ্চলে অধিক দেখা যায়। ভারি বর্ষণ ও জলাবদ্ধতার কারণে শহর অঞ্চলে বৃষ্টিজনিত বন্যা অধিক হয়। ২০১৪ সালের জুন মাসে ভারি বর্ষণের ফলে চট্টগ্রামে ভয়াবহ বন্যা হয়।

৪। **উপকূলীয় বন্যা (Coastal Flood):** বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল রেখা (প্রায় ৮০০ কিলোমিটার সংলগ্ন এলাকাতে উপকূলীয় বন্যা দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহাসোপান, বঙ্গোপসাগরে পূর্ব অংশের ফানেল ও মোচাকৃতির উপকূল রেখার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছাসের উচ্চতা (সর্বোচ্চ ১০-১৫ মিটার) অধিক হওয়ার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর, ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল, ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায ভয়াবহ বন্যা হয়।

বন্যা ব্যবস্থাপনা

Flood Management

যেহেতু বাংলাদেশে বন্যা হওয়ার আশংকা, বন্যার প্রকোপ ও বন্যার ঝুঁকি একেবারে নির্মূল করা যাবে না একারণে প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। যথা- অ-কাঠামোগত ও কাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনা[১]।

অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা

Non-Structural Management

অ-কাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনায় স্থান ভেদে প্রধান তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। যথা-

১. বন্যা পূর্ব ব্যবস্থাপনা
২. বন্যাকালীন ব্যবস্থাপনা
৩. বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

[1]https://modmr.portal.gov.bd/sites/default/files/files/modmr.portal.gov.bd/policies/0a654dce_9456_46ad_b5c4_15ddfd8c4c0d/NPDM(2016-2020)%20-Final.pdf.

১. **বন্যা পূর্ব ব্যবস্থাপনা (Pre- Flood Management):** বন্যা পূর্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বনায়ন, বসত বাটি, বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য, সম্পদ ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথা-

ক. **বনায়ন (Forestation):** বনায়ন পরিবেশ দূষণ রোধ এবং বন্যাজনিত মাটির ক্ষয়রোধ করে। তাই অধিক হারে বনায়ন প্রয়োজন। বিশেষ করে বন্যা প্রবণ এলাকায় বাড়ির চারপাশে কড়ই গাছসহ অন্যান্য গাছ লাগানো যেতে পারে।

খ. **বসত বাটি (Settlement):** বন্যা প্রবণ এলাকায় ঘরের মেঝে উচুঁ করা, সম্ভব হলে ইট সিমেন্ট এর পাকা ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়া নতুন জেগে ওঠা চরে বসতবাড়ি নির্মাণ না করাই ভালো।

গ. **বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য (Pure Water and Food):** বন্যার পানিতে টিউবওয়েল যাতে না ডুবে এমন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন করা উচিত। বন্যার সময় বাড়িতে মুড়ি, চিড়া, গুড় প্রভৃতি শুকনো খাবার মজুদ রাখতে হবে। নিরাপদ স্থানে ফসলের বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ. **সম্পদ (Property):** গবাদি পশু, মূল্যবান সম্পদ বন্যার পূর্বে মূল্যবান স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে।

ঙ. **আশ্রয়কেন্দ্র (Shelter):** বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবর্তী মহিলা এবং মেয়েদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. **বন্যাকালীন ব্যবস্থাপনা (During Flood Management):** বন্যাকালীন ব্যবস্থাপনায় আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি, সুরক্ষা ও ত্রাণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যথা-

ক. **আশ্রয় (Shelter):** বন্যার সময় নিকটস্থ উঁচু স্থান, বাঁধে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হবে। প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিস ঘরের চালের পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. **বিশুদ্ধ পানি (Pure Water):** পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি বা ফুটিয়ে অথবা টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে।

গ. **সুরক্ষা (Safety):** কার্বলিক এসিড মিশ্রিত সাবান টুকরা ঘরের চারকোণে রাখলে সাপ ঢুকবে না।

ঘ. **ত্রাণ (Relief):** সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী যা পাওয়া যায় তা দিয়ে অভাব মিটাতে হবে এবং ত্রাণ প্রদানকারীদের সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৩. **বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (Post Flood Management):** বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনাসমূহ নিম্নরূপঃ

- বন্যার পরপরই পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগ যেমন টাইফয়েড, ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে তাই প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দেওয়া যেতে পারে।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে নিজের বসতবাটিতে ফিরে যেতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাসযোগ্য করতে হবে বা পূনঃনির্মাণ করা যাবে।
- স্বল্প সময়ে উৎপাদন যোগ্য ফসল চাষ, বাড়িতে শাক সবজি ফলানো, পুকুর ডোবায় মাছ সংগ্রহ অর্থাৎ জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা

Structural Management

সর্বোপরি বন্যা ব্যবস্থাপনার বন্যার বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে বিপদাপন্ন এলাকায জরুরি ত্রাণসামগ্রী মজুদ রেখে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এছাড়াও বন্যার পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণে পরিবীক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, প্রভাব ও সাড়াদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্যাটেলাইট ইমেজ এর মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা হয়। উক্ত মডেল

অনুযায়ী বন্যা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় বন্যার ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় । ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যথা-

- বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও অধিদপ্তরকে ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
- বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের অনুসন্ধান উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সারসংক্ষেপঃ

ভূ- প্রকৃতিগতভাবে, বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ি ভূমি ব্যতীত বাংলাদেশ সমতল ভূমি। যা মূলত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহ দ্বারা বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে। এছাড়াও উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু সম্পন্ন বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২২০০-২৫০০ মিলিমিটার। প্রাকৃতিক কারণে প্রতিবছর বন্যায় প্লাবিত হয়। বাংলাদেশে পাহাড়ি নদীর পানি উপচে আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টির জন্য বন্যা এবং অধিক জলাবদ্ধতার কারণে নগর বন্যাও দেখা যায় । স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী ভারি বর্ষণের দরুন পাহাড়ি নদীর পানি উপচে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এলাকায় আকস্মিক ভাবে যে বন্যা দেখা যায় তাকে আকস্মিক বন্যা বলে। সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি প্রভৃতি জেলায় আকস্মিক বন্যা দেখা যায় । বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নদীর পানি প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাবে বন্যা হয়। বৃষ্টিজনিত বন্যা দেশের দক্ষিণ, পশ্চিম অঞ্চলে অধিক দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহাসোপান, বঙ্গোপসাগরেরর পূর্ব অংশের ফানেল ও মোচাকৃতির উপকূল রেখার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছাসের উচ্চতা (সর্বোচ্চ ১০-১৫ মিটার) অধিক হওয়ার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা হয়। যেহেতু বাংলাদেশে বন্যা হওয়ার আশংকা, বন্যার প্রকোপ, বন্যার ঝুঁকি একেবারে নির্মূল করা যাবে না তাই গ্রহণ করা হয়। অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে বন্যা পূর্ব ব্যবস্থাপনা, বন্যাকালীন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা । অপরদিকে কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় বন্যার পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণে পরিবীক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, প্রভাব ও সাড়াদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় । বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্যাটেলাইট ইমেজ এর মাধ্যমে এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা যায় এবং উক্ত মডেল অনুযায়ী বন্যা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাঠ-৮.৩ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা
Cyclone and Storm surge Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন;
- অ-কাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বায়ুর অনিয়মিত প্রবাহের দরুন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। সমুদ্রের পানিপৃষ্ঠের বায়ুপুঞ্জের মধ্যে নিম্নস্তরের বায়ু উষ্ণ ও আদ্র হয় এবং ওপরের দিকের বায়ু শীতল ও শুষ্ক হয়। বায়ুর প্রবাহের সময় নিম্নের উষ্ণ ও আদ্র বায়ু ওপরে ওঠে ওপরের শীতল বায়ুর সাথে ঘনীভূত হয়ে আদ্রতা বাড়ে এবং বৃষ্টিপাত হয়। ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সমুদ্রের ওপর সংঘটিত হয়ে সমুদ্রের পাশ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিসাধন করে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় বায়ু প্রবাহের গতিবেগ থাকে ৬৫ কি.মি বা এরও বেশি। ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু আবর্তনের কেন্দ্রকে চোখ বলে। ঘূণিঝড়ের জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি নিকটবর্তী এলাকায় অন্তত ২৭ ডিগ্রি সেলিসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ ও আদ্র বায়ু প্রয়োজন হয়।

ঘূর্ণিঝড় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ঘূর্ণিঝড় ভারত মহাসাগরের উপকূলে সাইক্লোন, চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন,ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলি, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে হারিকেন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রতিবছর মার্চ ও নভেম্বর মাসে উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় হয়। ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২৫ কি.মি/ঘণ্টা এবং জলোচ্ছাসের উচ্চতা ছিল ৬.০-৭.৬ মিটার (আবহাওয়া অধিদপ্তর ২০০৯)। এছাড়াও ১৯ মে ১৯৯৭, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালের সিডর এবং ২৫ মে ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা নামে পরিচিত।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা
Cyclone and Storm surge Management

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনায় প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। যথা- অ-কাঠামোগত ও কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা। নিম্নে অ-কাঠামোগত ও কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো।

কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা
Structural Management

কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থপনা ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। নিম্নে উভয়প্রকার ব্যবস্থপনা আলোচনা করা হলো।

১। ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা (Risk Reduction Management): ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থপনায় - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময় ব্যবহারের জন্য বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগে রয়েছে ১৯৯৮ টি আশ্রয় কেন্দ্র, বরিশালে বিভাগে ১৫৩৫ টি এবং খুলনা বিভাগে ১৭৪১ টি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। জেলাভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যার টেবিল ৮.১ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থপনায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনি প্রতিষ্ঠা ও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সতর্কীকরণের আধুনিকায়ন করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সতর্কীকরণে গণসচেতনতাও তৈরি করতে হবে।
- সর্বোপরি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

টেবিল - ৮.১ বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা

জেলা	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা
বাগের হাট	১৬৩ টি
বরগুনা	২১৬ টি
বরিশাল	৫২ টি
ভোলা	৬৭৭ টি
ঝালকাঠি	১৭ টি
পটুয়াখালি	৩৪০ টি
পিরোজপুর	৭০ টি
খুলনা	১২৪ টি
সাতক্ষীরা	৮২ টি

উৎস : ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা : বাংলাদেশ মার্চ- ২০১৬,
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২। **জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা (Emergency Response Management):** ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত পুনঃস্থাপন ও মেরামত করা প্রয়োজন । এছাড়াও জরুরি ভিত্তিতে দুর্গত এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে এবং মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি, জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

অ-কাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা

Non – Structural Cyclone Management

অকাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। যথা- প্রস্তুতিপর্ব, দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

১। প্রস্তুতিপর্ব (Preparation Stage) :

- ঘূর্ণিঝড় হতে পারে এমন মাসগুলিতে স্থানীয় ভাবে সচেতন থাকতে হবে।
- দুর্যোগে কী কী করণীয় সেই সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হতে হবে।
- দুর্যোগের সময় মূল্যবান জিনিস কোথায় ,কীভাবে রাখবে, কী করবে তার পূর্ব পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- যথাসম্ভব উচুঁ স্থানে শক্ত করে লোহা বা কাঠের পিলার দিয়ে ঘর তৈরি করতে হবে।
- উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল রাখতে হবে যাতে লোনা পানি ও ময়লা না ঢুকে।
- বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন।
- প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে সাঁতার জানা প্রয়োজন।

২। **দুর্যোগকালীন** ব্যবস্থাপনা **(During Disaster Management):** বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র বাড়ির মেয়ে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে সময় নষ্ট না করে পৌঁছে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্লাস্টিক কাগজের

বা কাপড়ের প্যাকেট করে ব্যাগে ভরে গর্তে রেখে ঢাকনা দিয়ে পুঁতে রাখতে হবে। উঁচু জায়গা না থাকলে শক্ত গাছের সাথে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে যাতে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছাস উড়িয়ে নিতে না পারে।

৩। **দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (**Post **Disaster Management):** দ্রুত উদ্ধারকারী দল খাল, নদী , পুকুর ও সমুদ্রে ভাসা এবং বনাঞ্চলে বা কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের দ্রুত উদ্ধার করবে। দ্রুত উৎপাদনশীল ধান ও শাকসবজির চাষ করতে হবে। ঝড় কমলেই বের হওয়া যাবে না কারণ প্রবল বেগে আবার ঝড় আসার সম্ভাবনা থাকে। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট অথবা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে হবে। নারী বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ত্রাণ বণ্টন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

বায়ুর অনিয়মিত প্রবাহের দরুন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। সমুদ্রের পানিপৃষ্ঠের বায়ুপুঞ্জের মধ্যে নিম্নস্তরের বায়ু উষ্ণ ও আদ্র হয় এবং উপরের দিকের বায়ু শীতল ও শুষ্ক হয়। বায়ুর প্রবাহের সময় নিম্নের উষ্ণ ও আদ্র বায়ু ওপরে ওঠে ওপরের শীতল বায়ুর সাথে ঘনীভূত হয়ে আদ্রতা বাড়ে এবং বৃষ্টিপাত হয়। ঘুর্ণিঝড় সাধারণত সমুদ্রের ওপর সংঘটিত হয়ে সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিসাধন করে। ঘুর্ণিঝড়ের সময় বায়ু প্রবাহের গতিবেগ থাকে ৬৫ কি.মি বা এরও বেশি। ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু আবর্তনের কেন্দ্রকে চোখ বলে। ঘূণিঝড়ের জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি নিকটবর্তী এলাকায় অন্তত ২৭ ডিগ্রি সেলিসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ ও আদ্র বায়ু প্রয়োজন হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-ভারত মহাসগরের উপকূলে সাইক্লোন, চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন,ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলি ,ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে হারিকেন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রতিবছর মার্চ ও নভেম্বর মাসে উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনা দুই প্রকার। যথা- কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা ও অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা। কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থপনা ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। অ-কাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। যথা- প্রস্তুতিপর্ব, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ।

পাঠ-৮.৪ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাসমূহ
Laws and Policies of Disaster Management in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন, শৈত্যপ্রবাহ ও বজ্রপাতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা, এবং বিভিন্ন কর্মসুচি প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা - ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
Laws of Disaster Management 2012

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর অধিভুক্ত বিভাগ, ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়াও উক্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ সেবা প্রদানের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫
Policies of Disaster Management 2015

উক্ত নীতিমালার উল্লিখিত নীতিসমূহের প্রেক্ষিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯
Parmanent Order for Disaster Perspective

উক্ত আদেশাবলি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত ও সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা উক্ত আইন অনুসারে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনপিডিএম) ২০২১-২০২৫
National Plan for Disaster Management, NPDM ,2021-2025

দুর্যোগ বিষয়ক বাংলাদেশের ভিশন, মিশন এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পদ্ধতির দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত কৌশলগত পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০
Bangladesh Delta Plan 2100

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ হলো আন্ত:খাত সমন্বিত, দীর্ঘমেয়াদি, অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাস করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে উক্ত ৬টি দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ অঞ্চলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ৬টি হটস্পট হলো-

- উপকূলীয় অঞ্চল (৬টি নদী বাহিত জেলা ও ১৩টি উপকূলীয় অঞ্চল)
- বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল
- হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল (৭টি জেলা)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (পাহাড় ধস ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল)
- নদী অঞ্চল এবং মোহনা (বন্যা প্রবণ অঞ্চল)
- নগরাঞ্চল (ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা)

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Integrated Disaster Management

পরিবেশ একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। এই কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কোনো একক সংস্থা বা সেক্টরের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন সম্ভব নয়। এই কারণে পরিবেশের প্রায় সকল উপাদানের (পানি, খাদ্য, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, কৃষি, শিল্প, মৎস ও প্রাণী সম্পদ, ভূমি, মানব স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাধারণ অর্থনীতি) ওপর ভিত্তি করে নীতিমালা প্রণয়ণ করে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করা হয়। তাই পরিবেশের প্রায় সকল উপাদানের ওপর নির্ভর করে পরিবেশ বিষয়ক সকল নীতিমালা বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভর করে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালাসমূহের সমন্বিত ভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা (Disaster Resiliance) অর্জন সহজ হচ্ছে। সম্প্রতি বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ জনিত চ্যালেঞ্জসমূহ বাংলাদেশ সফলভাবে মোকাবেলা করছে। দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরস্পরযুক্ত পাঁচটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সামগ্রিক বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতিগত উপায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপন, বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে করতে হবে। চিত্র-৮.১ লক্ষ করুন।

চিত্র - ৮.১ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

- **দুর্যোগ প্রস্তুতি:** যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে।
- **আগাম সতর্কতা:** আসন্ন আপদ থেকে জীবন সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য আগাম সতর্কতা প্রয়োজন।

- **জরুরি সাড়াদান:** প্রাকৃতিক ও মাবন সৃষ্ট আপদে জরুরি মানবিক সেবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- **পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার:** দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভালো অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের কার্যকর কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশকে প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নদীভাঙন, শৈত্যপ্রবাহ ও বজ্রপাতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা, এবং বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে -, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা - ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। পরিবেশ একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। এই কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও সমন্বিত বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনা। কোনো একক সংস্থা বা সেক্টরের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন সম্ভব নয়। এই কারণে পরিবেশের প্রায় সকল উপাদানের (পানি, খাদ্য, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, কৃষি , শিল্প , মৎস ও প্রাণী সম্পদ , ভূমি , মানব স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাধারণ অর্থনীতি) ওপর ভিত্তি করে নীতি মালা প্রণয়ন করে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করা হয়। তাই পরিবেশের প্রায় সকল উপাদানের ওপর নির্ভর করে পরিবেশ বিষয়ক সকল নীতিমালা বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভর করছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকির পরিবেশ লিখুন।
২. বন্যা কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?
৩. বন্যা সংঘটিত হওয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে বন্যা কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করুন।
৪. আকস্মিক বন্যা কাকে বলে?
৫. বন্যা ব্যবস্থাপনায় অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন।
৬. কাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনার বর্ণনা করুন।
৭. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
৮. অ-কাঠামোগত ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা কী?
৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করুন।
১০. বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাসমূহ কী কী?
১১. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ কাকে বলে?
১২. সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।